

শিক্ষার্থীদের ওপর বাণিজ্য আর পরীক্ষার চাপ

শিক্ষা ব্যবস্থা

আনু মুহাম্মদ

পাঠ্যপুস্তক নিয়ে সর্বশেষ যে কলেঙ্কারি হলো তার দুটো দিক আছে। একটি ছাপার ত্রুটি, নিম্নমান ছাড়াও অমার্জনীয় মাত্রার ভুল। আরেকটি হলো, পাঠ্যসূচিতে উল্লেখযোগ্য মাত্রার পরিবর্তন। প্রথমটিতে প্রমাণিত হয় এসব পাঠ্যপুস্তক লেখা, সম্পাদনা ও মুদ্রণের দায়িত্বে যারা আছেন, তাঁদের মধ্যে অযোগ্য ও দায়িত্বহীন লোকজন অনেক, তাঁদের নিয়োগের প্রক্রিয়ায় ব্যাপকমাত্রায় অনিয়ম বা বাণিজ্য বা অন্ধ দলীয়করণ ছাড়া এটা সম্ভব নয়। আর দ্বিতীয়টিতে প্রমাণ হয় সরকার তার রাজনৈতিক কৌশলের কারণে স্কুলের পাঠ্যবইয়েও কিছু মৌলিক পরিবর্তন এনেছে। বাণিজ্য, দায়িত্বহীনতা আর ক্ষমতার কৌশল—সবকিছুরই শিকার হচ্ছে শিক্ষার্থীরা ও জাতি।

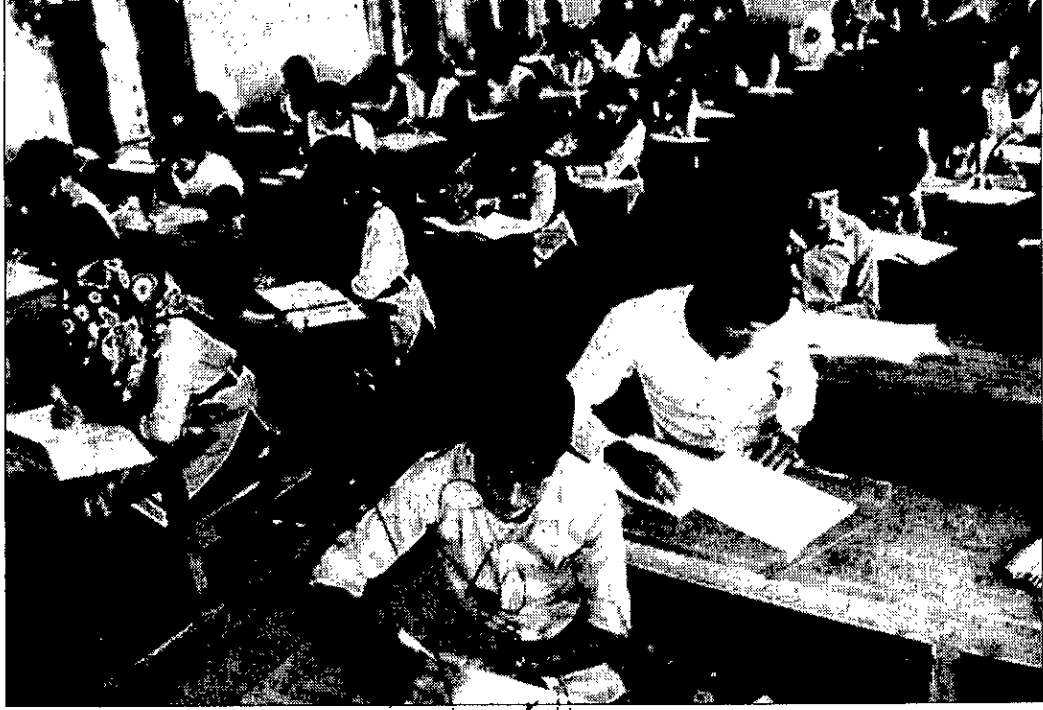
পাঠ্যপুস্তকের এসব ভ্রান্তি আর বিভ্রান্তি দিয়েই শিক্ষাক্ষেত্রের বিপর্যয় শুরু বা শেষ হয়; বরং বলা যায়, আরও অনেক মৌলিক সমস্যার এটি এক প্রতিফলন। সরকার ঢাকঢোল পিটিয়ে বিনা মূল্যে বই বিতরণকে নিজেদের বড় এক সাফল্য হিসেবে প্রচার করে। কিন্তু এসব বই শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় কতটা ব্যবহৃত হয়, সে ব্যাপারে তারা কি কোনো খোঁজবর নেয়? শিক্ষার্থীদের এসব বই পড়ার সুযোগ এখন কমই হয়, তাদের প্রধানত পড়তে হয় পয়সা দিয়ে কেনা গাইড বই। পরীক্ষা বেড়েছে, সিলেবাস বেড়েছে, আর সেই সঙ্গে বেড়েছে কোটিং সেন্টার। সরকারের শিক্ষাব্যয় আনুপাতিক হারে কমে, আর শিক্ষার্থীদের প্রকৃত ব্যয় বাড়ে। বাংলাদেশে মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত তো বটেই, একজন গরিব মানুষও সন্তানকে লেখাপড়া শেখাতে প্রাণান্ত করেন এখন। রাত-দিন কাজ করেন, খেয়ে না খেয়ে ঋণ করে তাঁরা টাকার জোগাড় করেন। আর এই আকুতির সুযোগ নিয়ে বাণিজ্যের এক বিশাল জাল তৈরি হবে, সরকারই তাতে পৃষ্ঠপোষকতা দেবে, কেন? কেন শিক্ষার্থীদের ওপর পরীক্ষা আর বইয়ের এত বোঝা থাকবে? কেন অভিভাবকদের ওপর নিতানতুন ব্যয়ের চাপ বাড়বে?

স্কুলের লেখাপড়া যে আনন্দময় হতে হবে, এটা নিয়ে কে দ্বিমত করতে পারে? শিশুর চিন্তা ও সৃজনশীলতার ভিত্তি গঠন, জগৎকে তাদের সামনে একে একে তুলে ধরা, তাদের মধ্যে ক্রমে জন্ম নেওয়া হাজারো প্রশ্নের জবাবের পথ তৈরি, কৌতুহলকে দমন না করে তার ক্রমবিকাশ—এগুলোর জন্যই স্কুলশিক্ষা হওয়ার কথা। বর্ণমালা থেকে শুরু করে রং চেনা, ফুল-ফল-পশু-পাখি থেকে গাছ, নদী, মানুষের বৈচিত্র্য, ছড়া, গল্প—এগুলোর মধ্য দিয়ে শিশুর জগৎ খুলে যাওয়ার কথা, সেই জগৎটি ধরিয়ে দেওয়ার জন্যই প্রাথমিক বিদ্যালয় আর শিক্ষক। ক্রমে গণিত, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভাষা-সাহিত্য, ভূগোল, সমাজ সম্পর্কে তার কৌতুহল সৃষ্টি ও তা মেটানোর জন্য উচ্চবিদ্যালয় পর্ব হওয়ার কথা। এখানেও শিক্ষকদের ভূমিকা শিক্ষার্থীদের ভেতরের কৌতুহল জাগিয়ে দেওয়া, তৈরি করা জিনিসপত্র গিলিয়ে দেওয়া নয়।

শিক্ষার যতগুলো পর্ব আছে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক শিক্ষা। তারপর মাধ্যমিক শিক্ষা। এগুলোর মধ্য দিয়ে যে ভিত্তি তৈরি হয়, তার ওপরই দাঁড়ায় কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা। সে কারণে এই ভিত্তিকালের পাঠ্যসূচি, শিক্ষা কার্যক্রম, প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ, শিক্ষকদের মেধা ও মনোযোগ রাষ্ট্রের কাছ থেকে সবচেয়ে মনোযোগ, দায়িত্বশীলতা ও আর্থিক সংস্থান দাবি করে। আমি মনে করি, শিক্ষাক্ষেত্রের সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তিদের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত থাকা দরকার, তাঁদের কর্মক্ষমতা ও মনোযোগ নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধাও তা-ই থাকা অত্যাৱশ্যক। কেননা, এই ভিত্তি কতটা মজবুত তার ওপর ভর করেই উচ্চশিক্ষা পর্বের শক্তি দাঁড়ায়, সমাজের বিকাশের গতিমুখ তৈরি হয়।

বর্তমানে শিক্ষাব্যবস্থা যেভাবে সংগঠিত হচ্ছে, তাতে না শিক্ষার্থীরা শিক্ষার্থী থাকতে পারছে, না শিক্ষকেরা শিক্ষকের ভূমিকায় থাকতে পারছেন। শিক্ষার্থীদের প্রধান মনোযোগ এখন সার্টিফিকেট লাভ, জিপিএ নম্বর বাড়ানো। আর শিক্ষকদের ভূমিকা বাণিজ্যিকীকরণের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজেদের আয়-রোজগার বাড়ানো। আর সরকারের ভূমিকা নতুন নতুন সাইনবোর্ড লাগিয়ে আর পাসের হার যেকোনো মূল্যে বৃদ্ধি করে নিজেদের সুনামের তালিকা বাড়ানো।

একসময় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোটিং ছিল খুবই কম। কিন্তু প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা চালুর পর শিশু শিক্ষার বিপর্যয় হলেও ব্যাপকমাত্রায় বেড়েছে কোটিং। দুই বছর আগে গণসাক্ষরতা অভিযানের একটি গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা গেছে, শিক্ষা সমাপনী



সিলেবাসের স্বীতি আর পরীক্ষার সংখ্যা বৃদ্ধিতে শিক্ষার্থীদের চাপের সঙ্গে অভিভাবকদের ব্যয়ও বেড়েছে

পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য দেশের ৮৬ দশমিক ৩ শতাংশ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের কোটিং করতে হয়েছে। আর ৭৮ শতাংশ সরকারি বিদ্যালয়ে কোটিং ছিল বাধ্যতামূলক। প্রতিবেদনে আরও জানানো হয়েছিল যে 'পাসের হার বাড়তে খাতায় নম্বর বাড়িয়ে দেওয়া, প্রশ্নপত্র ফাঁসসহ নানা অনিয়ম হচ্ছে। পরীক্ষার হলে দেখাদেখি করে লেখা এবং উত্তরপত্র মেলানোর জন্য শেষের ৪০ থেকে ৬০ মিনিট অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।' গ্রামীণ ও শহর এলাকার ১৫০টি উপজেলা বা থানার ৫৭৮টি বিদ্যালয় নিয়ে এ গবেষণা করা হয়।

সিলেবাসের অনাবশ্যক স্বীতি আর পরীক্ষার সংখ্যা বৃদ্ধিতে শিক্ষার্থীদের চাপের সঙ্গে অভিভাবকদের ব্যয়ও বেড়েছে। এই পরীক্ষার জন্য প্রাইভেট পড়ার নির্ভরশীলতা বাড়ছে, পাঠ্যবইকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে গাইড বই। শিশুরা শেখার আনন্দ ও সৃজনশীল হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। প্রায় সব প্রতিষ্ঠানেই মাসিক অর্থ দিয়ে বাধ্যতামূলক কোটিং করতে হয়। আর অনেক প্রতিষ্ঠানে কোটিং না করলেও টাকা দিতে হয়। স্কুলের শিক্ষকদের কাছে প্রাইভেট পড়াও অনেক ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক। এর বাইরে আছে গাইড বই কেনা। গাইড বই আর কোটিং সেন্টার এই দুটোই বর্তমান সময়ের স্কুলশিক্ষার দুই স্তম্ভ।

'সৃজনশীল' নামে পরীক্ষাপদ্ধতি চালু করা হলো সৃজনশীলতা বাড়ানোর কথা বলে। সৃজনশীল শব্দটার এরকম অপব্যবহার আগে কখনো হয়েছে বলে জানি না। এই পরীক্ষাপদ্ধতির কারণে বই পড়া আরও কমে গেছে, নির্ভরশীলতা বেড়েছে কোটিং সেন্টার আর গাইড বইয়ের ওপর। এমনকি শিক্ষকেরাও এখন গাইড বইয়ের ওপর অধিক নির্ভরশীল। এমনকি প্রশ্ন করার জন্যও। সৃজনশীল নামের প্রশ্নপদ্ধতি একে কাঠামোবদ্ধ, তার ওপর এর জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়নি। সর্বোপরি বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগে বিভিন্ন রকম অনিয়ম, নিয়োগ-বাণিজ্যে মেধার পরাজয় হওয়ার কারণে সক্ষম মানুষের সংখ্যাও কমে গেছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের একাডেমিক সুপারভিশন প্রতিবেদনেই বলা হয়েছে, 'সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি প্রণয়নের ছয় বছর পরিয়ে গেলেও অধিকাংশ শিক্ষক সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতিই বোঝেন না। এ কারণে এসব শিক্ষক নোট-গাইড থেকে প্রশ্ন করেন।... সরকারি হিসাবে সারা দেশে এ সংখ্যা ৪৫ ভাগ। আর শিক্ষক নেতাদের হিসাবে এই সংখ্যা প্রায় ৮০ ভাগ।' তবে শিক্ষকদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে বলে শিক্ষা অধিদপ্তর দাবি করছে। সৃজনশীল পদ্ধতি জানার জন্য বিদেশেও প্রশিক্ষণ নিয়েছেন অনেক সরকারি কর্মকর্তা। শিক্ষক প্রশিক্ষণে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। (দৈনিক ইত্তেফাক, ২১ নভেম্বর ২০১৬)

শিক্ষকদের অবস্থাও সঙ্কট কয়েক দিক থেকে। প্রথমত, তাঁদের বেতন থেকে আয় যেহেতু অনেক কম, সেহেতু ধরেই নেওয়া হয় তাঁরা প্রাইভেট বা কোটিং থেকে পুষিয়ে নেবেন। কিন্তু সময় ও শ্রম এত দিক দিয়ে একজন শিক্ষক কীভাবে ক্লাসে

মনোযোগী হবেন, কীভাবে নিজেকে বিকশিত করবেন? দ্বিতীয়ত, তাঁদের একদিকে বলা হবে পাসের হার কম হলে, জিপিএ-৫ কম হলে প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে, আবার খাতাও দেখতে হবে খুব কম সময়ে। তাহলে পরীক্ষায় নকল কে ঠেকাবে? কীভাবে তাঁরা যথাযথভাবে খাতা দেখবেন? তৃতীয়ত, যদি একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষকের চাকরি হয় উঁচু অঙ্কের টাকা সালারি দিয়ে, সেই টাকা উঠবে কীভাবে? প্রাইভেট, কোটিং বা অন্য কোনো বাণিজ্যিক পথই তো সামনে রাখা হয় মূল্য হিসেবে।

আর শিক্ষার্থীদের অবস্থা? বইয়ের বোঝা বাড়ছে তো বাড়ছেই, বাড়ছে পরীক্ষার চাপ। বাড়ছে অভিভাবকদের প্রত্যাশার চাপ। শিক্ষানীতি যখন প্রথম ঘোষিত হয় ২০১০ সালে, তখন এ রকম ধারণা হয়েছিল যে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার বোঝা কমবে, পুনর্বিন্যাস করা হবে পুরো কাঠামো। অষ্টম শ্রেণিতে পরীক্ষা হবে, এরপর দ্বাদশ শ্রেণিতে। কিন্তু অজানা কারণে শুরু হয়ে গেল প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা। প্রায় ৩০ লাখ শিক্ষার্থী যে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে তার কারণে বড় সুবিধা পেল কোটিং আর গাইড ব্যবসায়ীরাই। মাঝখানে মন্ত্রণালয় এই পরীক্ষা বাতিল করার ঘোষণা দিলেও মন্ত্রিসভায় গিয়ে তা বাতিল হয়ে যায়। এরপর এসব ব্যবসাকে বৈধতাও দেওয়া হয়। গাইড ও কোটিংওয়ালদের শক্তি যে কতদূর বিস্তৃত, তা এ থেকে প্রমাণিত হয়।

প্রাথমিক পর্যায়ের একজন শিশু যদি শুধু রং, প্রকৃতি, বর্ণমালা, ভাষা, গণিতের প্রাথমিক পাঠ, ছড়া, গল্প শেখে আর নিজের কথা নিজে লিখতে পারে আর কিছু দরকার হয় না। মাধ্যমিক পর্যায়ে যদি তার সঙ্গে আরও যোগ হয় ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান ও গণিত, সমাজের প্রাথমিক পাঠ—তাহলেই হবে। মুখস্থ করার কেন প্রয়োজন হবে? কেন গাইড বই দরকার হবে? স্কুলে পাঠদান হলে কেন কোটিং লাগবে? কেন এত পরীক্ষা থাকবে? স্কুলে যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ করলে যারা আজ ব্যক্তিগত উদ্যোগে কোটিং বা টিউশনি করছেন, তাঁরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষকতাই অস্বীভূত হতে পারেন। রাষ্ট্রের সে জন্য তার অস্বীকার অনুযায়ী দায় নিতে হবে। পরীক্ষা আর বাণিজ্যের চাপের এই অত্যাচার শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবক কারও পক্ষেই টেনে চলা সম্ভব নয়।

স্কুলের পথে বড় বড় বইয়ের ব্যাগ টানতে টানতে, স্কুল, কোটিং সেন্টার, টিউটর—এই ছোট্ট ছোট্ট টানে আর বিবর্ণ হচ্ছে আমাদের সন্তানরা। খেলার মাঠ নেই; শ্বাস নেওয়ার, খেলার, চিন্তার, আনন্দের না জায়গা আছে, না সময় আছে। কী হবে ভবিষ্যৎ? এই শিশুদের আর এই দেশের? আমরা যদি আমাদের সন্তানদের একটু শ্বাস নিতে দিই, ওদের নিজেদের ভেতরের যে ক্ষমতা তাকে মুক্ত হতে দিতে চাই, তাহলে এ নিয়ে সোচ্চার হতেই হবে।

● আনু মুহাম্মদ : অর্থনীতিবিদ ও অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।
anu@juniv.edu/anujuniv@gmail.com